বাবাসাহেব আম্বেদকর

নিতাই বসু

গ্রন্থতীর্থ

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

গ্রামের প্রত্যন্ত সীমায় ছিল একটা পল্লি। সেখানে থাকত মাহার সম্প্রদায়ের মানুষ। তারা অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য। তাদের বাড়িগুলোর কোনো ছিরিছাঁদ নেই। এক-এক ফালি জমিতে ঠাসাঠাসি, গাদাগাদি করে গড়ে তোলা হয়েছে তাদের ঘরগুলো। ওই ঘরগুলোর ছাউনিতে তারা টালি ব্যবহার করতে পারে না, কাশ বা সাবাই ঘাস ব্যবহার করে। এই পল্লিতেই তারা অন্ত্যজ হয়ে জন্মায়, অন্ত্যজ হয়ে বেঁচে থাকে, অন্ত্যজ হয়েই একসময় মরে যায়।

মহারাষ্ট্রে অস্পৃশ্যদের মধ্যে মাহারদের সংখ্যা বেশি হলেও আরও নানারকম অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষ আছে—মারিয়া, খোটে, চামার, পঞ্চম, অতিশূদ্র—হরেকরকম গোষ্ঠীতে তারা বিভক্ত।

মহারাষ্ট্রেরই অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের একজন মানুষ হলেন রামজি শকপাল। মিলিটারিতে চাকরি করেন তিনি এবং চাকরিসূত্রেই তিনি বাস করেন মধ্যপ্রদেশের মউ শহরে। মাহার বংশের মানুষ হয়েও রামজি শকপাল সেকালের নর্মাল স্কুল থেকে ট্রেনিং নিয়ে মিলিটারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন। তিনি মারাঠি ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, পারদর্শী ছিলেন খেলাধুলোতে।

রামজি শকপালের বাবা ছিলেন মালোজি শকপাল। তিনিও চাকরি করতেন মিলিটারিতে। অস্পৃশ্য হলেও মাহাররা বরাবরই বীরের জাত। মারাঠা রাজাদের সেনাবিভাগে মাহারদের জন্য আলাদা রেজিমেন্ট ছিল। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে মাহার সম্প্রদায় থেকে সেনাবাহিনীতে যথেষ্ট পরিমাণ লোক নিয়োগ করা হয়েছিল

এবং ইংরেজরা তাদের সেনাবাহিনীর প্রতিটি ক্যাম্পে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার জন্য ওই সম্প্রদায়ের মানুষ যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিলেন।

মালোজি শকপালের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন দুজন, রামজি আর মীরাবাঈ। নিঃসন্তান মীরা বিধবা হওয়ার পর দেশের বাড়িতেই থাকতেন। আর, মিলিটারিতে চাকরির সূত্রে সপরিবারে রামজি বাস করতেন মউয়ের একটা মিলিটারি কোয়ার্টারে।

মীরা শেষ পর্যন্ত দাদা রামজির কোয়ার্টারে একদিন বেড়াতে এলেন। দাদা রামজির স্নেহে, বউদি ভীমাবাঈয়ের আন্তরিকতায় এবং ভাইপো-ভাইঝিদের আকর্ষণে তাঁর আর ঘরে ফেরা হল না।

কিন্তু মীরার জীবনটা যেন বৈচিত্র্যহীনতায় হাঁফিয়ে ওঠে। তিনি জামা-কাপড় কাচার অছিলায় দাদার কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে খানিকটা দূরে একটা শাখা নদীতে যান। একদিন তিনি চারজন সন্ন্যাসীকে দেখতে পেলেন। চুল-দাড়িতে তাদের মুখ ঢাকা। খালি গা, কৌপীন পরনে, চুল-দাড়ির জঙ্গল মাথায়, হাতে কমণ্ডলু।

তাড়াতাড়ি রাস্তা থেকে পাশে সরে দাঁড়ালেন মীরা। ছোঁয়াছুঁয়ি তো দূরের কথা, সন্ন্যাসীদের ছায়াও মাড়ানো চলবে না ওঁর। উনি মাহার জাতের মেয়ে। সন্ন্যাসীরা যদি উঁচু জাতের লোক হন তাহলে তো মহা অনর্থ বাধাবেন। মাহাররা যে অস্পৃশ্য, অচ্ছুত। আর, কে না জানে অচ্ছুতদের ছায়া মাড়ানোও পাপ।

ওই সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজনকে মীরা তাঁর ছোটোকাকা বলে চিনতে পারলেন এবং বাড়িতে এসে দাদা রামজিকে বলতেই তিনিও সন্ন্যাসীদের ডেরায় গেলেন। প্রথমে সংশ্লিষ্ট সন্ন্যাসী নিজেকে ধরা দিতে চাইছিলেন না। কিন্তু রামজির আকুল আবেদনে তিনি আর নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারলেন না। ধরা দিলেন

তিনি। কিন্তু রামজির ডেরায় যেতে সম্মত হলেন না। শুধু স্নেহবশত আশীর্বাদ করে গেলেন, 'তোর ঘরে আসবে এমন একটা সন্তান, যে শুধু বংশের মুখ আলো করবে না, জগৎকে আলো দেবে। দীন-দুঃখী মানুষ তার কাছে আশ্রয় খুঁজে পাবে। ইতিহাস তাকে মনে রাখবে।'

রামজির কথা শুনে আনন্দে ও উদ্বেগে চুপ করে থাকেন ভীমাবাঈ। তিনি তেরোটি সন্তানের জন্ম দিলেও অকালেই চলে গেছে নজন। বেঁচে আছে শুধু দুটো ছেলে আর দুটো মেয়ে। তিনি শুধু ভাবেন, এরপরে যেই-ই আসুক, ছেলে কিংবা মেয়ে, শুধু ঈশ্বর যেন তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। ঈশ্বরের কাছে ভীমাবাঈয়ের শুধু এটুকুই প্রার্থনা।

রামজি একদিন স্ত্রীকে বললেন, হিন্দু শাস্ত্রকারেরা সমাজটাকে চারভাগে ভাগ করেছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর শূদ্র। শূদ্ররা সবার নীচে। কিন্তু তারও নীচে রয়েছে আরও এক সম্প্রদায়। অতিশূদ্র। এরা আরও পতিত। এরা অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য, অচ্ছুত, দলিত। আসল জাত হচ্ছে এই দুটো—স্পৃশ্য আর অস্পৃশ্য। আমরা মাহাররাও এই অস্পৃশ্য, দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ। মাহার ছাড়াও চণ্ডাল, পারিয়া, মানেন, আগেরিস, মেইলাট, পোলিয়া, মোগেরি, হাড়ি, ডোম—সারা দেশ জুড়ে রয়েছে এ-রকম অসংখ্য অস্পৃশ্য সমাজের মানুষ। কী অসহ্য দুর্দশা আর কষ্টের মধ্যে এদের দিন কাটাতে হচ্ছে, তা উচ্চবর্ণের মানুষের বোধে অবর্তমান। অথচ মানবতাবাদী মানুষ তো পৃথিবীতে কম আসেননি। রামানুজ, চক্রধর, রামানন্দ, কবীর, চৈতন্য, একনাথ, তুকারাম, রুহিদাস—এঁরা তো সেই মানবতাবাদের বার্তাবহ। এঁরা বলেছেন— সব মানুষই ঈশ্বরের সন্তান। মানুষে মানুষে কোনো ভেদ নেই।

ভীমাবাঈ বললেন, আমার বাপের বাড়িতে দেখেছি, কবীরকে

খুব মান্য করা হয়। কাকারা খুব গর্ব করে বলেন—আমরা কবীরপন্থী।

রামজি বললেন, কাকারা ঠিকই বলেন। আমাদের অস্পৃশ্যদের মধ্যে অনেকেই এখন কবীরপন্থী। আমি নিজেও কবীরপন্থী। জাত-পাত নিয়ে এই ধরনের আলোচনা প্রায়ই হয় রামজি ও ভীমাবাঈয়ের মধ্যে।

আবার সন্তান-সম্ভাবনা দেখা দিল ভীমাবাঈয়ের। চোদ্দোবারের বার তিনি মা হতে চলেছেন। সাংসারিক কাজকর্ম তিনি বরাবরের মতো এবারও করছেন। তবে এবার তাঁর পুজোর আকর্ষণটা যেন একটু বেশি।

পথে-ঘাটেও নানা অভিজ্ঞতা হয়েছে রামজির। একদিন মাঠের মধ্যে যেতে যেতে তিনি দেখলেন অস্পৃশ্য শ্রেণির চারজন লোক একটা মরা গোরুকে নিয়ে যাওয়ার সময় নির্জন মাঠের মধ্যে সেই মরা গোরুটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে মাংস কেটে নিল। ওরা খানিকটা খাবে এবং কিছুটা বিক্রি করবে। তিনি দেখলেন অভাব কীভাবে মানুষকে মনুষ্যত্বহীন করে ফেলছে। তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র পথ ভিক্ষে করা আর এই মরা পশুর মাংস খাওয়া।

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

১৮৯১ সালের ১৪ এপ্রিল। ভীমাবাঈয়ের কোলে এল তাঁর চতুর্দশ সন্তান। ছেলে। সদ্যোজাত ছেলেকে দেখে রামজি বললেন, আমি এ-ছেলের নাম রাখলাম ভীম। ভীমরাও রামজি।

খুশিতে উচ্ছল হয়ে ভীমাবাঈ বললেন, বেশ ভালো নাম হয়েছে। ওর দুই দাদা—বলরামরাও আর আনন্দরাও। ওর নাম ভীমরাও। বেশ মানিয়েছে নামটা।

ভীমের জন্মের মাত্র একবছর পরে ভারত সরকার এমন একটা আইন জারি করল যার ফলে ভারত সরকারের সেনাবাহিনীতে মাহারদের নিয়োগ করা বন্ধ হয়ে গেল।

ভীমের যখন বছর দুয়েক বয়স, তখন মিলিটারি চাকরি থেকে অবসর নিলেন রামজি। ফলে মউ-এর মিলিটারি কোয়ার্টার্স ছেড়ে সবাইকে নিয়ে রামজিকে চলে আসতে হল কোঙ্কনের দাপোলিতে।

পাঁচ বছর বয়সে ভীমকে ওখানকার একটি প্রাথমিক স্কুলে ভরতি করানো হল। এই সঙ্গে ভীমের মেজদা আনন্দ রাওকেও ভরতি করানো হল ওই স্কুলে। কিন্তু পেনশনের মাসিক মাত্র পঞ্চাশ টাকা আয়ে রামজি ওখানে বেশিদিন থাকতে পারেননি।

তিনি দাপোলি ছেড়ে এবার চলে এলেন মুম্বাইয়ের সাতারাতে এবং এখানকার সেনানিবাসে একটি চাকরিও জুটিয়ে নিলেন। ওখানে একটি প্রাথমিক স্কুলে ভীম ও আনন্দকে ভরতি করিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু ভীম যখন মাত্র ছবছরে পা দিয়েছে, তখন তার মা ভীমাবাঈ মারা গেলেন।